।। ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ।।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির অন্তর্ভুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবী-দ্রজীবনে পার্বত্যভ্রমণের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি সারাজীবনে যে বিচিত্র পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন, সেই বিচিত্র পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে রবী-দ্রনাথ বারে বারে বিভিন্ন জায়গায় নির্জন পার্বত্য পরিবেশের সন্ধান করেছেন। বর্তমান গবেষণায় রবী-দ্রনাথের পার্বত্যভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখতে পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে রবী-দ্র সৃষ্টির পর্যালোচনা করেছি।

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই প্রকৃতির একটি বিশেষ প্রভাব সব সময়ই দেখা গেছে। মানব জীবনের পাশাপাশি প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে সব সাহিত্যেই একটা আবশ্যকীয় উপাদান এবং প্রেরণা রূপে দেখা দেয়। রবী-দ্রসাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রকৃতির বিচিত্ররূপের মধ্যে পার্বত্যরূপের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। কোন একজন কবি যখন বিশেষভাবে এই পার্বত্যরূপের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন বুঝতে হবে তার পিছনে বিশেষ একটি মানসিকতা কাজ করছে। রবী-দ্রসাহিত্য বিশ্লেষণে কিভাবে এই পার্বত্য পরিবেশ সহায়ক হয়ে উঠেছে এবং তার ভিতর দিয়ে রবী-দ্রনাথের কোন বিশেষ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, সেটাই দেখানো হয়েছে এই গবেষণায়।

রবী-দ্রনাথ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন। শুধু ভ্রমণ করেই তিনি সময় অতিবাহিত করেননি। চিঠিপত্র থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় পাহাড় পারিপার্শ্বিকতার ছবি ফুটে উঠেছে। কোন স্থানকে সামনে রেখে তার প্রভাবকে সরাসরি রচনায় আনার চেষ্টা তিনি করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব সহজভাবেই স্থানগত প্রভাব বা পারিপার্শ্বিকতার চিত্র লেখার মধ্যে স্থান পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণ বলেই তাঁর লেখা মাধুর্যময় এবং অন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে।

এই অনুষঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের সামান্যতম আলোচনা করি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সাহিত্যকে রোমান্টিক সাহিত্য বলা হয়। এই যুগে নির্বাসিত প্রকৃতির পুনর্বাসন হল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রন, শেলী ও কীটস এর কাব্যে আমরা প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্যের ছবি দেখতে পাই। এযুগে যেন শহুরে সভ্যতার একঘেঁয়েমির নিরুদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি।

ব্রাউনিং ইংরেজ কবি হয়েও জীবনের অধিকাংশ বছর ইটালীতে কাটিয়েছেন। তাই ইটালীর ছবিটি তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :

Open my heart and you will see
Engraved in it is Itally.

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে রবী-দ্রনাথের প্রকৃতি-পূজায় অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয় কবিই, প্রকৃতি যে প্রাণময়ী এবং প্রকৃতি ও মানব যে একই স্থানে সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ তা অনুভব করেছেন। কি-তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির রূপের মধ্যে যে-সৌ-দর্য আছে, তা যে পরম সু-দরের প্রকাশ—এই অনুভূতিকেই তাঁর প্রকৃতি-পূজার মূলমন্ত্র করেননি। প্রকৃতির সৌ-দর্য-উদ্‌ঘাটন তাঁর কবি-কর্ম নয়। প্রকৃতির সৌ-দর্য তাঁর প্রাণ যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সেই অনুভূতিই তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে নব বলে বলীয়ান করে, তাকে সাংসারিকভাবে কলুষ হতে মুক্ত করে, ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে ও গভীর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দেয়। প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যের সম্মুখে তাঁর হৃদয় গলে গিয়ে ভাবদ্‌ভক্তি-তে আপ্লুত হয়েছে। প্রকৃতির এই সব দৃশ্য, সমস্ত-ভাবনা-চি-তা দূর করে, হৃদয়ের গভীর স্থৈর্য সম্পাদন করে ওকে ভাবদুপলব্ধির উপযোগী করে তোলে।

Tintern Abbey -র সুবিখ্যাত লাইন কয়টির মধ্যেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিকে ভাবদুপলব্ধির সহায়ক বলে অনুভব করেছেন ;

That blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened :- That serene and blessed mood

প্রকৃতির সৌ-দর্যের নিস্তব্ধ, গভীর ধ্যানে স্থূল জগৎ-চেতনা ও আত্মচেতনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশ্ব অনুস্যূত শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, এই মিলন-অনুভবের ফলে গভীর আনন্দে তিনি সৃষ্টির প্রাণধারার রহস্য বুঝতে পেরেছেন। প্রকৃতি এখানে কবিকে তাঁর আত্মোপলব্ধির সহায়তা করেছে। The Prelude (১৮০৫) কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ তেরোটি সর্গে ' Growth of a Poet's Mind' লক্ষ্য করেছিলেন। এই কবিতার ত্রয়োদশ সর্গে পেরিয়ে-আসা সাগরের সৈকতে, বিপরীত পটে, পর্বতের ইমেজ পড়েছেন কবি :

A hundred hills their dusky backs upheaved
All over the still Ocean, and beyond
Far, far beyond, the vapours shot themselves,
In headlands, tongues, and promontory shapes,

অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া কবিসত্তার এই প্রতিমান এই সর্গে Snowdon চূড়ায় আরোহণের উপলব্ধি জানিয়েছে :

And lastly, from its progress have we drawn
The feeling of life endless, the great thought
By which we live. Infinity and God.

কবি কীট্সের La Belle Dame Sans Merci (১৮১৯) স্থলপথে অভিযানের কবিতা। রহস্যময়ী সুন্দরীর মায়াবী আহ্বানে কবি কীট্স্ এ কবিতায় 'Meads' থেকে 'elfin grot' পর্যন্ত যাত্রায় জীবন ও মৃত্যুর চূড়ান্ত-সত্য অনুভব করেছিলেন :

She took me to her elfin grot
. . . . . .
. . . . . .
I saw Pale kings and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all;

রহস্যময় গিরিগুহা বা Grot (elfin grot) এর অভিজ্ঞতা কবি কীট্সের পক্ষে নিঃসন্দেহে রোমান্টিক।

একইভাবে আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘজীবনে দেশ বিদেশে বহু স্থানে থেকেছেন। সব সময় না হলেও সেইসব স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতা তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্যসৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। যেমন ধরা যাক, শিলাইদহ পর্বের কথা। এই সময় রবীন্দ্রনাথ পদ্মা বিধৌত অঞ্চলে একটানা প্রায় দশ বছর কাটিয়েছেন। শিলাইদহ পতিসর—সাহাজাদপুর অঞ্চলে জীবন-যাপনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রভাব আমরা তৎকালীন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাই। এই পারিপার্শ্বিকতার অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের পার্বত্য-ভ্রমণের স্মৃতি। বলাকার ৩৬ সংখ্যক কবিতার জন্ম কিছুতেই হতে পারত না, যদি না

তিনি কাশ্মীরে ঐরকম একটা পরিবেশকে কাছে পেতেন। মংপুতে লিখিত কবিতাবলীর মধ্যে যে পাহাড়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তাও সম্ভব হত না যদি না তিনি মংপুর নির্জন পরিবেশকে কাছে পেতেন। শেলী, কীটস্ ও বাইরন প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভালো বেসেছিলেন এবং তাঁদের রচনায় যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিকতা থেকে কিভাবে তাঁর বিভিন্ন ঘটনা উঠে এসেছে, প্রসঙ্গত তার কিছু সূত্র উল্লেখ করা গেল: প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলি শেলীর বড় প্রিয় ছিল, যেমন ঝটিকা, মেঘ, নদীস্রোত, নিয়ত পরিবর্তনশীল সমুদ্রের লীলা, ইটালীর আকাশের নীলকান্ত পাত্র থেকে উচ্ছ্বসিত রৌদ্রের সুবর্ণরেখা, গুহামুখ নিঃসৃত চঞ্চল জলপ্রপাত ইত্যাদি। এদের বর্ণনা ও ব্যবহার ঘুরে ফিরে তাঁর কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের নিকটও এই জাতীয় দৃশ্যই প্রিয়। পদ্মার জলধারা, যা নিয়ত চঞ্চল, তবু যার অন্ত নেই; আকাশে মেঘের লীলা; গুহানিঃসৃত জলস্রোত, সূর্যের উদার আলো। উভয় কবির যে এই জাতীয় দৃশ্যগুলি প্রিয়, তার কারণ, এর মধ্যে, এই পরিবর্তনশীল অথচ অপরিবর্তনীয় দৃশ্য গুলির মধ্যে, তাঁরা নিজেদের কবিধর্মের প্রতীক দেখতে পান। পদ্মা রবীন্দ্রনাথের এত যে প্রিয়, তা যেন তাঁর কাব্যের প্রতীক স্বরূপ। ফাল্গুনী নাটকের গুহামুখনিঃসৃত নদী অনন্ত রহস্যাবৃত জীবনের প্রতীক।

এদের সেই কবিধর্ম কি? নিয়ত-গতিশীলতা, চঞ্চলতা, পরিবর্তন প্রিয়তা সেই কবিধর্মের একটা দিক। এইরূপ যে কবিধর্ম, তার আর একটা দিক সীমাহীনতা, কারণ সীমাহীন গতি আকাশেই আপনার সার্থকতা পেতে পারে। আকাশের এই নিঃসীমতাকে প্রকাশ করে যে সূর্যালোক, তাও এই কারণে শেলী ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। শেলী তাঁর স্কাইলার্কের মত ইটালীর রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরের তলে বসে থাকতে যে কত ভালবাসতেন, তাঁর জীবনী-পাঠকেরা নিশ্চয়ই তা জানেন, আর রবীন্দ্রনাথের নিকটে আলোক কত ও কেন যে প্রিয়, তা কবির নিজমুখেই শোনা যাক —

"বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের, বিশেষত কাকের ডাক এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর —সবসুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়।' কেন জানিনে, মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য-উপন্যাস তৈরি হয়েছে।"[১]

দেখা যাচ্ছে দুপুরের রৌদ্র একটা স্বপ্নরাজ্যের দিকে কবির মনকে সঞ্চারিত করে দেয়। আবার— "আমি আলো ও বাতাস এত ভালোবাসি। গেটে মরবার সময় বলেছিলেন —

more light ! আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি , more light and more space অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে --কি-তু সেইজন্যেই এদেশের মাঠের দৃশ্য , নদীতীরের দৃশ্য আমার এত বেশি ভালো লাগে ।"[২]

এই আলোক বিকশিত বাংলার সমতলভূমি এত ভালো লাগে , কেন না , তাতে তাঁর চিত্তের গতিশীলতা কোন বাধা পায় না । নিম্নের অংশে কবি স্পষ্ট করে বলেছেন , এই আলোকে তিনি অসীমতাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান --

"আমি আকাশ এবং আলো এত অ-তরের সঙ্গে ভালোবাসি । আকাশ আমার সাকী...যেখানে আমার এই সোনার মদ সবচেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ , সেইখানে আমি কবি , সেইখানে আমি রাজা , সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ ব্যবহিত যোগ থাকবে ।"[৩]

নীচের রবী-দ্র অভিজ্ঞতার অংশ পড়লে ইটালীর রৌদ্রভাস্বর নভস্তল শায়ী শেলীর ছবিটি মনে লাগে --

"আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি । গাজিপুরে , পশ্চিমের পরমেও , আমি দুপুরবেলায় আমার ঘরের দরজা ব-ধ করি নি ।" ৪

আবার

"নদী আমি ভারি ভালোবাসি ; আর ভালোবাসি আকাশ ।"[৫]

বাংলাদেশের আকাশ ও নদী দুই-ই অসীমের লীলাক্ষেত্র । বাইরে যেমন আকাশ অ-তরে তেমনি অবকাশ । স্বভাবত দুই-ই অসীম , কি-তু বস্তু ও চি-তাভারে পূর্ণ হলে এদের কোথাও অসীমতার চিহ্ন থাকে না । কবির কি-তু সীমাহীন আকাশ ও নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ বড় প্রিয় । তিনি আরো উল্লেখ করেছেন :

"আমার যদি কোনো আলো থাকে , তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায় ; সেই জন্যেই আমি ছুটির দরবার করি --কেননা , ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ ।"

অবকাশ আর কিছুই নয় --তাহা অ-তরের অবকাশ । "কি-তু অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন । অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা । বৃহৎ যেখানে আছে , অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয় , একেবারে পরিপূর্ণ ।"[৬]

রবী-দ্রনাথ যেখানে পর্বত সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন, যেমন হিমালয় সম্বন্ধে ছয়টি সনেটে, সেখানে তাদের পটভূমিতে ভারতবর্ষ। হিমালয় ও ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র করে দেখবার উপায় নেই। নিশ্চল হিমালয় যোগমগ্ন কালগতির প্রতি প্রক্ষেপহীন ভারতবর্ষের প্রতীক; আর চঞ্চল নিয়ত পরিবর্তনশীল পদ্মা বাংলাদেশের। মহাকবি কালিদাস ও রবী-দ্রনাথ দু'জন দুই বিভিন্ন সভ্যতাকে প্রকাশ করছেন। কালিদাস একটি পুরাতন সভ্যতার কবি, বড়জোর সে সভ্যতাকে চির-তন বলতে পারি। সেজন্য কালিদাসের কাব্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই; হিমালয়ের মতো, কালিদাসের আরাধ্য মহাদেবের মতো, তাঁর কাব্য দ্বন্দ্ব সংঘাত রহিত; তা শা-ত। রবী-দ্রনাথ একটি নূতন সভ্যতার কবি; চঞ্চলতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের প্রতি ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যের প্রাণ। রবী-দ্রনাথের কাব্য অত্য-ত জটিল। আবার এই বাংলার সভ্যতার নূতন ধারার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারার সংঘাত ঘটিয়ে তাঁর কাব্যকে জটিলতর করে তুলেছে।

প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "রবী-দ্রনাথ কেমন যেন পর্বতকে সহ্য করতে পারেন না।"[৭] এই প্রসঙ্গে ভানুসিংহের পদাবলীর ৩৫ সংখ্যক পত্রাংশ তুলে ধরা হল।

"পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি —সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ —সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারি নে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেইজন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল্‌দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোনন পর্বতকে নমস্কার করি।"[৮]

প্রমথনাথ বিশী আরো বলেছেন, 'কবি সীমাহীন আকাশে মুক্তির রূপে দেখিতে পান, পর্বত সেই রূপকে বাধা-গ্রস্ত করে। নদী চঞ্চল, তার ধ্বনি আছে; তাই সে গানের প্রতীক। পর্বত নিস্তব্ধ তাহার রূপ সতত প্রত্যক্ষ; সে চিত্রের প্রতীক। বর্তমান ও অতীতের মহাকবিদ্বয় তাঁহাদের বিভিন্ন শিল্পধর্মকে নদী ও পর্বতে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।"[৯]

কবির ব্যক্তব্যের সঙ্গে সমালোচকের ব্যক্তব্য ঘনিষ্ঠ হলেও আমরা একমত নই। কেননা তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন। বহুরচনায় পাহাড় পরিবেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এমন কি এই পরিবেশ তাঁর ভালো লেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যখনই তিনি অবসর এবং সুযোগ পেয়েছেন, পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। দুর্গম পাহাড়েও তিনি উঠেছেন বহু কষ্ট স্বীকার করে। এমন কি রামগড়ে একটা বাড়ীও তাঁরা কিনে ছিলেন। দার্জিলিঙে তিনি ন'বার এসেছেন, তাছাড়া কোন কোন পাহাড়ে একাধিবার গিয়েছেন বস্তুত দেখা গেছে, কবিতা, গান, চিঠি, গল্প নাটকের খসড়া, উপন্যাসের পটভূমিকা প্রভৃতি রচনা তাঁর লেখনী দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পরিবেশের প্রভাব অবশ্যই। পরিবেশের মধ্যে থেকে এবং বাহির থেকে তাঁর রচনা লক্ষ্য করা গেছে। পাহাড় পরিবেশকে তিনি নিপুণ এবং নিবিড়ভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

রক্ত-করবী নাটকটির রচনা প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগেই রবী-দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য শিলঙ যাত্রা করলেন (২৬ এপ্রিল ১৯২৩)। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কবি শিলঙ থেকে ফেরেন আষাঢ়ের (১৩৩০) গোড়ায় বা জুন মাসের মাঝামাঝি। প্রায় দু'মাস ছিলেন শিলঙে।

এই যাত্রায় কবির সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, পুপে এবং রাণু অধিকারী (লেডি রাণু)। রবী-দ্রনাথ এঁদের শিলঙে পৌঁছে দিয়েই শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

শিলঙে কবি জিৎভূমি নামে একটি বাড়ীতে ছিলেন, বাড়ীটি ছিল বাংলার মতো। রবী-দ্রনাথ থাকতেন একটি ঘরে, একা, তার পাশের ঘরে পুপে ও রাণু সহ মীরা দেবী, এবং শেষের ঘরে প্রতিমা দেবী। শ্রীমতী রাণু তখন মাঝে মাঝেই কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন কবির কাছে। সেবারও সেইভাবেই শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে শিলঙে রয়েছেন। তখন তিনি স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। এই সময়কার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। রবী-দ্রনাথ এই সুন্দর পরিবেশে তাঁর ঘরে জানলার ধারে টেবিলে বসে লিখতেন, মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন। শ্রীমতী রাণু সারা বাড়ীতে, বাইরে দৌড়ঝাঁপ নাফালাফি ক'রে বেড়াতেন, কবির কাছে গিয়েও বসতেন। বিকেলে তাঁরা বেড়াতে বের হতেন। অনতিদূরে ছিল ময়ূরভঞ্জের মহারাজার বাড়ী, সেখান থেকে নিম-ত্রণ আসত। সামাজিক উৎসবেও কবি

কবি সবাইকে নিয়ে যেতেন। একদিন রাণুকে পাশে নিয়ে, কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে রবী-দ্রনাথ তেমনি এক অনুষ্ঠানে চলেছেন, শ্রীমতী রাণুর চুলগুলি খোলা অবস্থায় ছিল, মীরা দেবী সেই চুল বেঁধে দেবার প্রস্তাব করতেই রবী-দ্রনাথ বললেন, "না। খোলা চুলই থাক, একে মানিয়েছে।" একদিন আর-এক অনুষ্ঠান থেকে রাতের দিকে ফেরার পথে বিধানচ-দ্র রায়, তখন তিনিও শিলঙে ছিলেন, তাঁর সাদা শালটি শ্রীমতী রাণুকে দিলেন যাতে তাঁর ঠা-ডা না লাগে। কবিও তাই চাইছিলেন।

এমনি এক পরিবেশে কবি 'রক্ত-করবী'র প্রথম খসড়ায় ব্যস্ত।[১০]

শিলঙে, পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই ১ জুন তারিখে 'শিলঙের চিঠি'তে কবি জানাচ্ছেন:

জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।

কবিতাটি লেখার আগে ১১ মে তারিখে শিলঙ থেকেই অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখলেন:

একটা নাটক গোচের কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। এর থেকে অনুমান করা চলে, কবি শিলঙে পৌঁছবার পর, মে মাসের শুরুতেই রক্তকরবীর খসড়া পরিকল্পনা করেন এবং মে মাসের শেষের দিকে খসড়াটি লিখতে শুরু করেন। তবে প্রথম খসড়ায় কোন তারিখ উল্লিখিত হয়নি বা অন্য কোথাও কবি তা ব্যক্ত করেন নি। স্মৃতিচারণ করতে করতে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, রবী-দ্রনাথ কাউকেই তখন এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন আভাস দেন নি। কি-তু গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন এই লেখার কাজে, তা বোঝা যেত। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে "নাটক গোচের" অথবা শিলঙের চিঠি'তে উল্লিখিত 'নাটকে'র সূত্র ধরে বলা যায়, কবি তখন রক্তকরবী রচনাতেই ব্যস্ত।

এই নাটকটির রচনার মূলে আর একটি অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করা যায়। খুব সম্ভবত রবী-দ্রনাথ যে 'মানবী'র ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, তার একটি সত্যরূপ আছে। এ বিষয়ে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, যা তাঁর মুখ থেকে শোনা গেছে এবং সহায়ক হয়েছে। তিনি বলেছেন, "রবী-দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন – নন্দিনী তুই।" অর্থাৎ 'রক্তকরবী' নায়িকা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে যিনি কবিকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি কোন কল্পিত নারী নন, তিনি শ্রীমতী রাণু অধিকারী। রবী-দ্রনাথ তাঁকে নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যও বলেছিলেন।

রক্তকরবীর প্রথম খসড়ার এই আলোচনায় একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হ'ল যে, শিলঙের জিৎভূমি বাংলো, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় এই নাটকটির রচনার মূল সূত্র। পার্বত্য পরিবেশ ছাড়া এটি রচনার কথা কল্পনাই করা যায় না। এই বিশিষ্ট পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব ফেলেছিল।

'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। এই উপন্যাসের পটভূমিকার শিলঙের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের শেষে ব্যালাবুরি, বাঙ্গালোর, ২৫ জুন ১৯২৮ তারিখের উল্লেখ দেখা যায়। সুদূর দক্ষিণভারতে অবস্থান করে, রবীন্দ্রনাথ শিলঙের পার্বত্য পরিবেশের কথা ভাবছেন। তারই বর্ণনা এবং বিচিত্র অনুষঙ্গ উপন্যাসে বিদ্যমান। একথা অবশ্যই স্বীকার করা যায় যে, এইরূপ পরিবেশ ব্যতিরেকে "শেষের কবিতার মত উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারত না। শিলঙ পাহাড় রবীন্দ্রনাথের কত প্রিয় ছিল, এটাও তার একটা প্রমাণ।

'দুরাশা' গল্পটি দার্জিলিঙে অবস্থান কালে রচিত। গল্পটির প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩০৫ সাল। এই গল্পটির পটভূমিকা দার্জিলিঙ পাহাড় কেন্দ্রিক। অন্য কোন স্থানকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচনা করা সম্ভব হত না। পাহাড় পারিপার্শ্বিকতা সুন্দরভাবে কাজ করেছে।

শেষের কবিতা, রক্তকরবী, দুরাশা সবই রোমান্টিক পরিবেশের ফসল। রোমান্টিকতার পিছনে পাহাড়ের ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ খোলামাঠ, সমতল স্থান, নদী যেমন ভালবাসতেন অনুরূপ ভালবাসতেন, ধ্যানগম্ভীর পাহাড়, বৃক্ষলতাপাতা, ঝর্ণা এবং পাহাড়ের নিথর নির্জনতা। আসলে, সব কিছুর মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃতির আয়োঘ দান এবং তারই প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা বিশ্বকবির। এই সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণে এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, সমস্ত মহৎ কাব্যের মতই রবীন্দ্রকাব্য প্রকৃতপক্ষে বহুল পরিমাণে পারিপার্শ্বিকতা নির্ভর সৃষ্টি। বর্তমান গবেষণায় বিচিত্র পারিপার্শ্বিকতার মধ্য থেকে একটি দিক নির্বাচন করেছিলেন, তা হচ্ছে পার্বত্যভ্রমণের অভিজ্ঞতা। বাহ্যত দেখতে গেলে, যে কোন ভ্রমণের মত পার্বত্য ভ্রমণও ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অবসর যাপনের সহায়ক। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করলাম, বিভিন্ন পার্বত্য পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে একটি সুনিবিড় প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং এই প্রভাবে প্রভাবিত রচনাগুলি কিছুতেই সম্ভব হত না যদি না রবীন্দ্রনাথ এই সব বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে কাছে পেতেন। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, বিপুল রবীন্দ্ররচনার একটি বিশেষ অংশের অন্তরঙ্গে নিহিত

রয়েছে তাঁর পার্বত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। বর্তমান গবেষণায় তারই একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণার সেইটি ছিল নম্য, হয়তো তারই মধ্যে নিহিত রয়ে গেছে এই গবেষণার সার্থকতা। রবী-দ্রনাথের শিল্পী মনে নানা সময়ে দেখা প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য কোন রূপসী স্মৃতির মত করে সঞ্চয় করে রাখা। তাৎক্ষণিক কোন দৃশ্য পরিবেশের প্রভাবের চেয়েও শিল্পীর প্রাণে সঞ্চয় করে রাখা রূপস্মৃতি তাঁর সাহিত্যকর্মে সহযোগী হয়ে যেত। কবির মনের ভিতরেই আগে থেকে সঞ্চিত হয়ে থাকা আকাশ নদী প্রান্তর বা পর্বত তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিকর্মে রূপের সংবেদনাটিকে মিলিয়ে দিত। রবী-দ্র সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নিসর্গের এই স্মৃতি নির্যাসধর্মী উপস্থাপনার প্রক্রিয়াটি বেশী চোখে পড়ে।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. ছিন্নপত্রাবলী – পত্র সংখ্যা ১৪৯ – পৃ: ১৬৬
রবী-দ্ররচনাবলী–একাদশ খণ্ড - জন্মশতবার্ষিক

২. তদেব - পত্র সংখ্যা ১৫৪ পৃ: ১৭২

৩. তদেব – পত্র সংখ্যা ১৪৫ পৃ: ১৬২

৪. ভানুসিংহের পত্রাবলী – পত্র সংখ্যা ১৮ পৃ: ২৮২
রবী-দ্ররচনাবলী – একাদশ খণ্ড – জন্মশতবার্ষিক সং

৫. তদেব - পত্র সংখ্যা ৪১ পৃ: ৩১২

৬. জাপান যাত্রী - রবী-দ্ররচনাবলী –জন্মশতবার্ষিক সং দশম খণ্ড পৃ: ৫০২

৭. রবী-দ্র কাব্য প্রবাহ–দ্বিতীয় খণ্ড শ্রী প্রমথনাথ বিশী - প্রথম মিত্র - ঘোষ সং, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ পৃ: ১৮

৮. ভানুসিংহের পত্রাবলী - পত্র সংখ্যা ৩৫ পৃ: ৩০০
রবী-দ্র রচনাবলী - একাদশ খণ্ড - জন্মশতবার্ষিক সং

৯. রবী-দ্র কাব্য প্রবাহ - দ্বিতীয় খণ্ড - শ্রী প্রমথনাথ বিশী -
প্রথম মিত্র–ঘোষ সং, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ পৃ: ১১

১০. রক্ত-করবীর প্রথম খসড়া : তথ্য-পঞ্জী প্রণয় কুমার কুণ্ডু
রবী-দ্রবীক্ষা : ১৬ শ সংখ্যা : পৌষ ১৩৯৩ পৃ: ২৪–২৭